

একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

সন ১২৪০ সাল। সকালবেলা। কাল দোলপূর্ণিমা।

কালীপদ চৌধুরী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খই-দই খাইয়া তিনি এখনই রওনা হইবেন। অক্ষয় মিস্ত্রিকে ডাকিয়া আনিয়া কোঠাঘরের আনুমানিক ব্যয় ঠিক করিতে হইবে।

রামতারণ বাঁড়ুজ্যে কৃষ্ণনগর কোটের নকলনবিশ। গ্রামে অগাধ পয়সা-প্রতিপত্তি। দু'পয়সা করিয়াছেন, গোলাপালা, জমিজমাও করিয়াছেন। ছুটিতে রামচরণ বাড়ি আসিয়াছেন, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক টানিতেছেন সকালবেলা। কালীপদ চৌধুরীকে দেখিয়া কহিলেন—কোথায় চললে হে ?

—আপ্তে কাকা, অক্ষয় মিস্ত্রিকে একবার ডাকতে যাচ্ছি।

—কেন হে ? অক্ষয়মিস্ত্রিকে কি হবে তোমার ?

কালীপদ আসিয়া বসিলেন চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। বলিলেন—বাঃ, এবার মিছরে গাছটাতে খুব বোল হয়েছে দেখছি !

বসন্তের সকাল। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, আম্রমুকুলের সুমিষ্ট সৌরভে ভরপুর।

রামতারণ বলিলেন—আর-বারও বোল হয়েছিল ভালো, কুয়াশাতে সব ঝাঁই পড়ে গেল। দেখো এ বছর কি হয়। বোল তো ভালোই হয়, তবে টিকে থাকে না। বোসো বাবা।

এই সময় রামতারণের ভাইঝি একটা কাঁসার সাগুরিতে চাল-ভাজা, নারকেল-কোরা ও খানিকটা গুড় লইয়া আসিয়া বলিল—জেঠামশায়, খাবার খান।

রামতারণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ও শৈলি, এই তোর কালীপদ-দাদা এসেছে। বাড়ি গিয়ে তোর জেঠাইমাকে বল গে—

কালীপদ বলিলেন—না না, কাকা। আমি এই মাতুর খই-দই খেয়ে বেরিয়েছি। আমায় যেতে হবে সেই পুবপাড়া। অক্ষয় মিস্ত্রিকে পাওয়া দরকার। আমি উঠি।

—না না, বোসো, দুটি চালভাজা খেলে তোমাদের মতন ছেলে-ছোকরা মানুষের আর অক্ষিধে হবে না। যা শৈলি, নিয়ে আয় তো ! ভালো হয়ে উঠে এসে বোসো না ! তুমি আজকাল সেই জমিদারি সেরেস্তাতেই কাজ করছ তো ?

—আপ্তে হ্যাঁ।

একটু পরে শৈলি আর এক বাটি চালভাজা ও গুড় লইয়া আসিয়া কালীপদের সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামেও অবিবাহিত কিশোরী মেয়ে গ্রামের তরুণ যুবক প্রতিবেশীর সহিত গুরুজনের সম্মুখে কথাবার্তা বলিতে পারিত না।

শৈলি মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী, দেখিতে-শুনিতে ভালো। রংও ফর্সা। চাহিয়া দেখিবার ও দু-একটি কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কালীপদ সামলাইয়া গেলেন।

রামতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন— তার পর, অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে কী মনে করে ?

—দুটো পাকা ঘর করব ভাবছি, কাকা।

রামতারণ একটু বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেদিনের ছেলে কালীপদ, ওর বাবা পয়সা রাখিয়া যায় নাই মৃত্যুকালে। একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ও বিধবা মা লইয়া ওর সংসার। আজ আট-দশ বৎসর কি করিয়া চালাইতেছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে তাহার খবর রাখা আবশ্যিক মনে করেন নাই। কিন্তু সেই কালীপদ আজ তাহার

পৈতৃক আমলের চৌচালা খড়ের ঘর ছাড়িয়া পাকা বাড়িতে বাস করিবার স্পর্ধা করিতেছে, এত পয়সা ছোঁড়ার হাতে আসিল কিভাবে ?

রামতারণ বলিলেন—হুঁ।

—আচ্ছা কাকা, আপনি বলতে পারেন, দুখানা ঘর মাত্র, দরজা-জানালা, সামনে একটু রোয়াক—এতে কত খরচ পড়তে পারে ? তাই যাচ্ছিলাম অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে। আপনার আঁচ পেলে আর অতদূরে যাই নে।

—হুঁ।

—তাহলে যদি বলেন—

দাঁড়াও। কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হচ্ছে। আনি।

কাগজ-কলম আনিয়া হিসাবপত্র জুড়িয়া দেখা গেল আটশ টাকার কমে ওরকম একখানি ছোট বাড়ি তৈয়ারি হয় না। সব জিনিসের দাম বেশি। ইটের হাজার সাত টাকা। সাড়ে দশ আনা সিমেন্টের বস্তা। রাজমিস্ত্রির মজুর দশ আনা, পেটেল মজুরের চার আনা হইতে স'পাঁচ আনা। রামতারণ ভাবিয়াছিলেন, খরচের হিসাব পাইলে ছোঁড়ার চুলবুলুনি ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু দেখা গেল, তাহা নয়, ছোঁড়া দমিল না। বরং বলিল—আটশ' টাকা তো ? না হয় শ'খানেক টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে, কি বলেন ? তাহলে পাঁজি দেখে একটা শুভদিন দেখে দিন কাকা, সূত্র ফেলা যাক।

রামতারণ বলিলেন—তা একদিন দেখো এখন। কোঠা করছ—বড় আনন্দের কথা। তোমাদের উন্নতি দেখলে মনে বড়ই আনন্দ হয় বাবা। আহা, আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন। তা সবই ভাগ্য।

কালীপদ রামতারণ বাঁড়ুজ্যের পদধূলি লইয়া বলিলেন—আপনি আশীর্বাদ করুন কাকা, যেন মাকে অন্তত কোঠাঘরে শোয়াতে পারি। আপনাদের আশীর্বাদ—

হবে হবে বাবা, হবে বই কি। তবে হাজার টাকা টাকে গুঁজে তার পর কাজে হাত দিয়ো। দেখো, যেন অর্ধেক হয়ে পড়ে না থাকে ! বড় শক্ত কাজ। ছেলেমানুষ কিনা, তাই বলছি।

—আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে সব করব। আমার আর কে আছে আপনাদের পাঁচজন ছাড়া ? কত কষ্টে মানুষ হয়েছে বাবা মারা যাওয়ার পরে, সবই তো জানেন। কোনোদিন খাওয়া জুটেছে, কোনোদিন জোটেনি। ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে মায়ে-পোয়ে পরেছি। দুধ-ঘি-এর মুখ দেখিনি কোনোদিন।

—হ্যাঁ হে, তোমার ভগ্নীটি তো প্রায় এগারো বছরে পড়ল। আর তো ঘরে রাখা যায় না, এবার ওর একটা বিয়ের জোগাড় করো। পল্লীগাম জায়গা, লোকে কি বলবে না বলবে ! বাড়ি না হয় দু বছর পরে করো—ভগ্নীর বিবাহটি আগে দাও।

—তাও সন্ধান দেখছি কাকা। ওবেলা এসে বলব এখন সব। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

কালীপদ চৌধুরী চলিয়া গেলেন। রামতারণ বাঁড়ুজ্যের সকালটি মাটি হইয়া গেল। নাঃ, আজ আর কোনো কাজ করা চলিবে না। কি কুক্ষণে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে তামাক খাইতে বসিয়াছিলেন।

রামতারণ বাঁড়ুজ্যে অন্যভাবেও দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, একবার মিস্ত্রিদের কাজ করা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর একবার অন্য কি একটা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপদ চৌধুরীর কোঠাবাড়ি তাহাতে বন্ধ থাকে নাই। অবশেষে যেদিন সুন্দর দুইকুঠারি পাকা ঘর নির্মাণ শেষ করিয়া কালীপদ চৌধুরী গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিলেন, বাস্তুপূজা ও সত্যনারায়ণের সিম্মির আয়োজন করিলেন, রামতারণ সেদিন তাঁহার কর্মস্থল গোয়াড়িতে। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ি, কালীপদ চৌধুরীর মা সেই রাত্রিতে এ ঘরে প্রথম শুইলেন। জ্যোৎস্না-রাত্রি, বর্ষাকাল। মনে পড়িল, এই বর্ষার দিনে খড়ের ঘরে জল

পড়িত মটকা দিয়া, গরিব স্বামী কখনো সে দুঃখ ঘুচাইতে পারেন নাই। আজ উপযুক্ত ছেলে সে খড়ের চালার জায়গায় পাকা ঘর তুলিল। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।

জগদম্বা দেবী সে রাত্রে আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না। দোর-জানালায় নূতন রং মাখানো হইয়াছে—তাহার গন্ধটা বড় উৎকট। এক-একবার সে গন্ধটা মনে পরম আনন্দ বহন করিয়া আনে, চোখ বুজিয়া থাকিতে থাকিতে মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া ঘরের চারিধারে চাহিয়া দেখেন। না, পাকা ঘরই বটে। ওই তো কড়িকাঠ, ওই তো পাকা চুনকাম করা দেওয়াল—ওই সেই রঙের উৎকট গন্ধটা। স্বপ্ন নয় সত্যিই কোঠাঘরে শুইয়া আছেন বটে।

এই দিনটি হইতে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে মাতব্বর হইয়া উঠিলেন। রামতারণের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি হইতে চাহেন নাই, কিন্তু গ্রামের লোক সালিশ মীমাংসা ইত্যাদি কার্যে তাঁহার সাহায্য চাহিতে লাগিল, বারোয়ারির চাঁদা আদায়ের ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা আরো ভালো হইয়া উঠিল, তিনি কাছারির নায়েবি-পদে পাকাপোক্তভাবে বহাল হইয়া সুখ্যাতির সহিত উক্ত কার্য করিতে লাগিলেন।

মাহিনা কুড়ি টাকা বটে, কিন্তু রোজগার করিতেন ষাট-সত্তর টাকা। যে সময় ন সিকা উৎকৃষ্ট বালাম চাউলের মণ, দশ আনা গব্য ঘূতের সের, যোলো সের খাঁটি দুগ্ধ টাকায়, একটা দু-তিন সের ওজনের রোহিত মৎস্যের দাম বড়জোর এক টাকা—সে সময়ে কালীপদ চৌধুরী গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন মাতব্বর গৃহস্থ বলিয়া গণ্য কেন না হইবেন ?

বেলপুকুরের মহিমাচরণ গাঙ্গুলির কনিষ্ঠা কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে কালীপদ চৌধুরীর শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হইল। লক্ষ্মী যখন আসেন, কোন্ দিক দিয়া আসেন বোঝা যায় না। এই বিবাহের পর হইতেই কালীপদ চৌধুরীর অবস্থা খুব ভালো হইতে লাগিল। রামতারণ বাঁড়ুজ্যে বৃদ্ধ হইয়া কার্যে অবসর গ্রহণ করিলেন; নকলনবিশের কাজে পেনশন নাই, তাঁহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াপড়িল। তবে একেবারে গরিব হইয়া তিনি কোনোদিনই পড়েন নাই, কারণ হুঁশিয়ার রামতারণ অনেক জায়গাজমি করিয়া লইয়াছিলেন। বছরের ধান গোলায় মজুত থাকিত।

কালীপদ চৌধুরীর একটি ছেলে ও তিনটে মেয়ে। ছেলেটি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িবার পরে কিছুদিন বাড়ি বসিয়া জমিদারি সেরেস্ভায় কার্য শিখিতেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে দূরবর্তী মহকুমার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজি লেখাপড়ার চাল তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, দু-তিনটি ছেলে এন্ট্রান্স পাশও করিয়াছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যের বড় নাতি তাহাদের অন্যতম।

১২৮০ সাল।

কালীপদ চৌধুরীর ছেলে সুকুমার চৌধুরী দেশেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করিয়া দু'পয়সা উপার্জন করিতেছে। কালীপদ চৌধুরীর বয়স চৌষট্টির কোঠায় ঠেকিয়াছে, রামতারণ বাঁড়ুজ্যে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় এখনো বাঁচিয়া আছেন তবে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার আর ক্ষমতা নাই। তাঁহার ছেলেরা চাকুরি করিতেছে।

আবার বাড়ি হইবে।

সুকুমারের সময় নাই, সে পসারওয়ালা ডাক্তার, বৃদ্ধ কালীপদ চৌধুরী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় চুন, কোথায় সিমেন্ট। দুটি বড় সেগুন গাছ কাটাইয়াছেন সর্ব পরামানিকের বাগানে। মুর্শিদাবাদ হইতে করাত টানিবার মিস্ত্রি ও ছুতার মিস্ত্রি আনাইয়া সেই বাগানেই কাঠচেরাই ও দরজা জানালা কড়িবরগা ইত্যাদি তৈরি হইতেছে। ছেলে বাড়ি দোতলা করিবে, পূজার দালান তৈরি করিবে, পুকুর কাটাইবে—বৃদ্ধের উৎসাহের সীমা নাই। অতি বৃদ্ধ রামতারণ (৮৯) বলিলেন—কে ?

—এই কাকা, আমি কালীপদ।

—এসো এসো বাবা, কি মনে করে ?

—শুনলাম আপনি নাকি কথানা পুরনো কড়ি বিক্রি করবেন ?

—কার বাড়ি ?

—আজ্ঞে বাড়ি না, কড়ি। ঘরের কড়ি। বিক্রি আছে শুনলাম আপনার এখানে ?

—কেন ?

—সুকুমার বাড়িটা দোতলা করবে—আর বলছে পুজোর দালানটা করবে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়ার কৃপা সবই। যদি তাঁকে এবার আনা যায়। আর আমার তো এখন গেলেই হয়—আপনাদের কোলে-পিঠে মানুষ হলাম, আমরাই বুড়ো হয়ে গেলাম। এখন ওদের সব—নাতি দুটো আছে, ধুলোগুঁড়ো বংশের। আশীর্বাদ করুন যেন ওরা মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখে।

—বোসো, বোসো বাবা। সুকুমার হীরের টুকরো ছেলে, তা বাড়ি করবে বই কি দুপয়সা রোজগারও করছে। আর আমার ওই বাঁদরগুলো দেখো, মানুষ হল না। পুরনো কড়ি আছে, নিয়ে যেয়ো। ও আমার সেই পৈতৃক আমলের বাড়ির কড়ি। নিয়ে যেয়ো, দর একটা যা হয় ঠিক করে দেব।

কালীপদ বিদায় লইলে রামতারণ বাঁড়ুজ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

খাইতে পাইত না ওই কালীপদ চৌধুরী, ওর মা লোকের বাড়ি রাঁধুণীর কাজ করিয়া ছেলেকে মানুষ করিয়াছিল, তিনি তো সবই জানেন। আজ তাহার ছেলে দোতলা কোঠা তুলিতেছে, আবার পূজার দালান তুলিয়া দুর্গোৎসব করিবে বলিয়াও শাসাইয়া গেল। সবই অদৃষ্ট।

তিন মাসের মধ্যে সুকুমারদের দোতলা বাড়ি উঠিল বিস্তর ছুটাছুটির পরে। একখানা মনের মতো বাড়ি তুলিতে সোজা হাঙ্গামা নয়; চুন সুরকি ইট কাঠ জোগাড় করিতে এই তিন মাস পিতাপুত্রের সময়ে স্নান হয় নাই, সময়ে আহার হয় নাই। খুব ধুমধামে গৃহপ্রবেশ হইল, রামতারণবাঁড়ুজ্যে চিঁড়েদই-এর ফলার করিয়া গেলেন। আবার সেই আশ্বিন মাসে সুকুমারদের বাড়ির প্রথম দুর্গোৎসবে খিচুড়ি মাংস খাইলেন, কবির গান শুনিলেন।

পর পর এত আঘাত বোধ হয় অতিবৃদ্ধ রামতারণের সহ্য হইল না। সেই অগ্রহায়ণে শীতকালের প্রথমেই সামান্য দুদিনের জ্বরে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।

সুকুমার পৈতৃক ভিটাতেই দোতলা বাড়ি উঠাইয়াছিল। তাহার পিতা প্রথম যৌবনে সর্বপ্রথম যে একতলা ক্ষুদ্র বাড়িটা তোলেন ভিটাতে, যে বাড়িটা এক সময় রামতারণ বাঁড়ুজ্যের মনে কত ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, সে বাড়িটার আদর কমিয়া গেল। দোতলা বাড়ির পিছনে সেটা অনাদৃত অবস্থায় জিনিসপত্র রাখিবার ভাঁড়ারঘর এবং দু-একজন আশ্রিতা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের শয়নঘর হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হ্যাঁ কেবল একটি কথা, বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা ও সিন্ধি বিতরণ করা হইলে তার ওই পুরানো কোঠা বাড়িতেই হইয়া থাকে।

সুকুমার ডাক্তার হিসাবে নাম করিল ভালো। অনেক দূর হইতে লোকে রোগী দেখাইতে আসে। যাহারা আসে, তাহারা একবার ডাক্তারবাবুর নতুন দোতলা বাড়ি দেখিয়া যায়। পূজার দালান তো গ্রামে মোটে ওই একটি। দুর্গোৎসবও ডাক্তারবাড়ি ছাড়া আর কোথাও হয় না।

সুকুমারের দুই সংসার। প্রথম পক্ষের কোনো সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পর পর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে হইল। লোকে যে অনেক সময় গল্প করে, নিঃসন্তান প্রথমা স্ত্রী স্বামীর বংশরক্ষার জন্য নিজেই স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে, সুকুমারের জীবনে তাহা সত্যই বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সুকুমারের প্রথমা স্ত্রী তরুণালা পরমা সুন্দরী। অনেক খুঁজিয়াপাতিয়া কালীপদ চৌধুরী পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর দশ বৎসর কাটিয়া গেল, সন্তানসন্ততি বংশে একটিও আসিল না।

সুন্দরী তরুণালার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। খিড়কিতেই কালীপদ শখ করিয়া পুকুর কাটিয়া ঘাট বাঁধাইয়াছিলেন, পুকুরঘাটে যখন বড় বউ নাহিতে নামে, ঘাট আলো করে রূপে।

সেদিন রাত্রে তরুণালা স্বামীকে বলিল—একটা কথা রাখতে হবে।

—কি কথা ?

—বলো রাখবে ?

—না শুনে কি করে বলি ?

—তোমার আবার বিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, একটা কথার মতো কথা বটে ! একটা কেন, দুটো দাও !

—ও চালাকি রাখো। মেয়ে দেখে রেখেছি। ছেলেপুলে না হলে বংশ থাকবে কি করে ? পয়সাকড়ি রোজগার করছ কার জন্যে ?

—কথাটা সত্যিই ভেবে দেখিনি। না, বিয়ে করা দরকার হয়ে পড়েছে দেখছি।

—তুমি যতই চালাকি করো, আমি কিন্তু জানি বাবার মন খুব খারাপ। বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকলে তাঁর মনখারাপ হবারই কথা।

—এসব তোমার মনের কথা ?

—নিশ্চয়ই। তুমি কি ভাব আমি ঠাট্টা করছি ?

—সুকুমার সেবার কথাটা যতই ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিক, অবশেষে পুনর্বীর বিবাহ তাহাকে করিতেই হইল। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম নীরজাসুন্দরী, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয় ! বেশ স্বাস্থ্যবতী ও শান্তস্বভাব। বিবাহের তিন বৎসর পরে একটি কন্যা ও আরো দুই বৎসর পরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া ডাক্তারবাড়িআলো করিল।

তরুণালা সর্বদাই দোতলার ঘরে ছেলেটি লইয়া বসিয়া থাকে।

কেহ আসিলে গর্বের সঙ্গে বলে—এই দেখো পিসি, আমার ছেলে।

একবার একটি মন্তরা জুটিয়াছিল। সে বুড়ি পাশের বাড়ির শ্যামাপদ বাঁড়ুজ্যের মা। বড়লোকের বউ তরুণালার খোশামোদ করিয়া কখনো দুধ, কখনো পাটালি, কখনো একখানা নতুন কাপড়, কখনো বা এক কাঠা সোনামুগের ডাল হাতাইয়া যাইত। সেদিন তরুণালা অমন বলিতেই বুড়ি বলিল—আহা, বড় বউমার যা কাণ্ড !

তরুণালা বলিল—কেন খুড়িমা ?

—সতীন-পোর দেখা পেয়েছ, নিজের ছেলের সোয়াদ তো পেলে না—আহা মা ! দুধের সোয়াদ কি ঘোলে মেটে ?

—কেন ?

—আহা মা, তোমার মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়। কথায় বলে সতীন-কাঁটা, তার খোকা—তোমার তাতে কি ? বড় হয়ে কি ও তোমায় ভালো চোখে দেখবে ?

এইদিন হইতে তরুণালা তাহাকে এড়াইয়া চলিত।

ক্রমে নীরজাসুন্দরী আরো তিনটি পুত্রসন্তানের জননী হইল।

কনিষ্ঠ পুত্রটি লেখাপড়ায় ভালো হইয়া উঠিল, সব পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, সব বিষয়ে সমান জানে-শোনে। গ্রামের মধ্যে অমন ছেলে দেখা যায় নাই ইতিপূর্বে। বৃদ্ধ কালীপদ তো নাতিকে পলকে হারায় এমনি অবস্থা। নাতির কথা সকলকে গর্ব করিয়া বলিয়া না বেড়াইলে তাঁর দিন কাটে না।

যে বৎসর ছেলেটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল, সুকুমারের প্রথমা পত্নী তরুবালা সেবার বৈশাখ মাসে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সৎ ছেলেমেয়েগুলিকে কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিল।

তরুবালার মৃত্যুতে গ্রামের এমন লোক ছিল না যে চোখের জল ফেলে নাই। ১৩১০ সালের বৈশাখ মাস সেটা।

তার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। অনেক সুখদুঃখের ঝড় বহিয়া গেল সংসারের উপর দিয়া।

সুকুমারের ছেলে অনাথবন্ধু ফাইনাল ডিপার্টমেন্টে ভালো চাকরি পাইয়া দিল্লি চলিয়া গেল। অন্য দুটি ছেলের মধ্যে একটি উকিল ও অন্যটি ডাক্তার হইয়া কলিকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করিয়া দিল, কারণ দেশে নিজের বাবা পসারওয়ালা ডাক্তার, ডাক্তারি শিখিয়া ছেলে সেখানে বসিলে কোনো লাভ নাই। সুকুমারও ভাবিল, অনেক দিন হইতেই কলিকাতায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করিবার যে শখটা ছিল, নিজের ছেলের মধ্য দিয়ে সেটা সার্থক করিয়া তোলা যাক।

কালীপদ চৌধুরী এখন অতি বৃদ্ধ। বিশেষ নড়িতে চড়িতে পারেন না। নাতবউয়েরা সেবা করিলে খুব ভালো লাগিত বৃদ্ধের, কিন্তু একাল পড়িয়া গিয়াছে—নাতবউয়েরা স্বামীদের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘোরে।

যদি কোনো নাতবউ কখনো আসে গ্রামের বাড়িতে দু-এক সপ্তাহের জন্য, কালীপদ তাহাকে পাইয়া বসেন। যত গল্প তাহার সঙ্গে। সে বোচারিকে কাজ করিতে দিবেন না, তাহার নিজের ছেলেপুলেদের তদারক করিতে দিবেন না—কেবল বলিবেন, বোসো দিদি, বোসো। এই শোন, তোমার শ্বশুর যখন ছোট ছিল—

অর্থাৎ কেবল সুকুমারের গল্প।

বৃদ্ধ বলিলেন—বুঝলে দিদি, সুকুমার আমার বংশের চুড়ো—

তার পর বলেন, আগে এই ভিটাতে কি রকম খড়ের ঘর ছিল, তিনি হাতে সামান্য কিছু জমাইয়া পুরানো কোঠাঘরটি করেন। দুই কুঠুরি, ছোট্ট বারান্দা। সে কি আনন্দ উৎসাহের দিনই গিয়াছে ! চিরদিনের খড়ের ঘর ঘুচাইয়া প্রথম পাকা বাড়ি করার আনন্দ ! গ্রামের লোকের চোখেপ্রথম বড় হওয়া। অনেক লোকের প্রশংসা, অনেক লোকের ঈর্ষা অর্জন করা। জীবনে একটা কিছু করা হইল এই প্রথম। বংশের প্রথম কোঠাবাড়ি।

—তোমার দিদিশাশুড়ি, বুঝলে, আজ যদি বেঁচে থাকত—

নাতবউ ঠাট্টা করিয়া বলে—কোন্ পক্ষের কথা বলছেন দাদু ? আপনাদের সময়ে তো নাকি—

—ও, সে আবার কি ? ও হ্যাঁ, তা এক পক্ষই ছিল, এখন এই আর এক পক্ষ হয়েছে এমন টুকটুকে—বলিয়া নাতবউয়ের গাল টিপিয়া দেন।

নাতবউ বলে—ও দাদু, এবার চলুন আপনাকে বাসায় নিয়ে যাব।

—না দিদি, সে বয়েস আর কি আছে ? এখন গাড়িতে উঠতে নামতে ভয় হয়।

তার পর অনেক বছর কাটিয়া গেল।

১৩৪০ সাল।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর পৌত্র অনাথবন্ধু এখন ফাইনাল ডিপার্টমেন্টে বড় চাকুরে। পেনশন লইবার সময় এখনো হয় নাই, তবে খুব বেশি দেরিও নাই। বড় ছেলেটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অন্য দুটি ছেলে এখনো ছাত্র। অনাথবন্ধুর পিতা সুকুমার এখন বৃদ্ধ। ছেলেরা এখন আর তাহাকে ডাক্তারি করিতে দেয় না।

লেক রোডের ধারে হাল-ফ্যাশানের তেতলা বাড়ি সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। দুই ছেলের নামে পাশেই কয়েক কাঠা জমি আগেই অনাথবন্ধু কিনিয়া রাখিয়াছিলেন—আজ বছর দশেক আগে এক দালাল বন্ধুর সাহায্যে। গৃহপ্রবেশের দিন অনেক বড় বড় চাকুরে, এমন কি কয়েকজন সাহেবসুবো নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই হইল।

অনাথবন্ধুর প্রতিজ্ঞা ছিল কলিকাতায় বাড়ি না করিয়া বড় ছেলের বিবাহ দিবেন না। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তী ছাত্র ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ কত বড় বড় ঘর হইতে আসিতেছিল। এইবার বাদুড়বাগানের বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবারের মেয়ের সহিত শুভদিনে পুত্রের বিবাহ দিয়া অনাথবন্ধু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বৃদ্ধ সুকুমার ডাক্তার এই উপলক্ষে দেশের বাড়ি হইতে সেই যে কলিকাতার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া যান নাই। ছেলেরা যাইতে দেয় নাই।

নববিবাহিত পৌত্র অরুণ বলিল—কেমন বাড়ি হয়েছে দাদু ?

বৃদ্ধ সুকুমার বলিলেন—বেশ হয়েছে, চমৎকার !

—আর তুমি কিন্তু দেশে ফিরো না, সেখানে মশা, ম্যালেরিয়া—

—তা বটে। তবে—

—তবেটা আবার কি শুনি দাদু ? চল আমার সঙ্গে আমার সেখানে। শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে চমৎকার কোয়ার্টারস্—

—বেশ বেশ। হ্যাঁ দাদু, হাকিমি করে এসে সন্ধ্যাবেলা এতদিন কি করতিস ? আজ না হয় নাতবউ হল—

—কেন, পাশেই টেনিস কোর্ট। জেলখানার পাশেই। সরকারি ডাক্তার, খুরশেদ আলি সেকেন্ড অফিসার, সার্কল অফিসার দত্ত, জুট অফিসার আবদুল সোভান—সবাই টেনিস খেলি। তোমার নাতবউয়ের অভাব অনুভূত হয়নি একদিনও। চল দাদু আমার সঙ্গে—

—দাদু, গাঁ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওই গাঁয়ে বাবা যেদিন খড়ের বাড়ি ঘুচিয়ে প্রথম দুটি মাত্র পাকা কুঠুরি তুললেন, সেদিনের আনন্দ ওই ভিটের মাটির বুকু লেখা আছে। বংশের প্রথম কোঠাঘর। কত কষ্টের কত আনন্দের জিনিস ! ওই ভিটেতে আমার প্রথমা স্ত্রী—তোমার বড় ঠাকুরমা—

এই সময়ে অরুণের ভাই তরুণ আসিয়া ডাকিল—দাদা, ওপরে যাও—টেলিফোনে কে ডাকছে !

১৩৫০ সাল।

স্বর্গত সুকুমার চৌধুরীর গ্রামের ভিটা বনেজঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে। দোতলা কোঠার দেওয়ালে বড় বড় ডুমুর ও অশ্বখ বৃক্ষ। লোকে বলে—ডাক্তারের ভিটায় দিনমানে বাঘ লুকাইয়া থাকিতে পারে। গত আট বৎসর এ ভিটায় পুত্র ও নাতির কেহই আসে নাই। জানালা-দরজার অনেকগুলি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্বর্গত কালীপদ চৌধুরীর তৈরি প্রথম আমলের সেই একতলা বাড়ির ছাদ কয়েক বৎসর বর্ষার জল খাইয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—জীর্ণ দেওয়াল দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। সাপের ভয়ে আজকাল ডাক্তারের ভিটার ত্রিসীমানা কেহ মাড়ায় না।